কল্পনা করে লেখো (১০০-১৫০ টি শব্দের মধ্যে) :

(ক) তুমি যদি সুলতানি আমলে দিল্লির একজন বাসিন্দা হও তাহলে কী কী ভাবে তুমি দৈনন্দিন প্রয়োজনে জল পেতে পারো ?

(খ) মনে করো তুমি একটি ইউরোপীয় কোম্পানির ব্যবসায়ী। ব্যবসার প্রয়োজনে তোমাকে বোম্বাই থেকে সুরাট হয়ে আগ্রার মুঘল দরবারে যেতে হচ্ছে। তুমি কোন পথে যেতে পারো ? এঁকে দেখাও।

(গ) খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় বঙ্গোপসাগরে ভাগীরথীর মোহনা থেকে তুমি ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে যাচ্ছ। পথে তুমি কোথায় কোথায় ইউরোপীয় কুঠি দেখতে পাবে, তা মানচিত্রের সাহায্যে দেখাও।

বি. দ্র.

অধ্যায়ের ভিতরে *পড়ার মাঝে মজার কাজ* ও *ভেবে বলো* শীর্ষক এবং ভেবে দেখো খুঁজে দেখোর *কল্পনা করে লেখো* শীর্ষক *কৃত্যালি* গুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে *প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন* (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে।

তুলো ধোনা, সুতো রং করা এবং কাপড় তৈরি

মাছ ধরা এবং পাখি ধরা

মুঘল শিল্পীদের চোখে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার কয়েকটি দিক

আগ্রার দুর্গ নির্মাণ (১)

আগ্রার দুর্গ নির্মাণ (২)

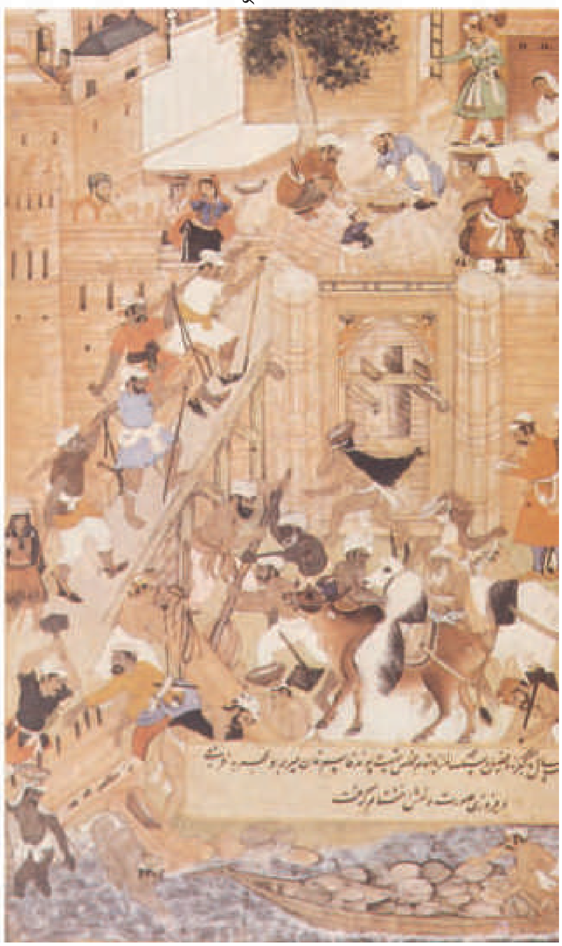

সপ্তম অধ্যায়

জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি

সুলতানি ও মুঘল যুগ

৭.১ জীবনযাত্রা

সুলতান, বাদশাহ, রাজা-উজিররা দেশ শাসন করেন। তাঁদের কথা লেখা থাকে নানা বইতে। কিন্তু, দেশের অগণিত সাধারণ গরিব মানুষের কথা বিশেষ কিছু বলা থাকে না। অথচ সেই গরিব জনগণের চাষ-বাস, শিল্প থেকে যে টাকা আয় হয় তাতে রাজা-বাদশাহের শাসন চলে। তাহলে দেখা যেতে পারে কেমন ছিল সাধারণ মানুষের জীবন সুলতানি এবং মুঘল যুগে।

দেশের বেশির ভাগ মানুষ গ্রামেই বাস করতেন। স্থানীয় চাহিদা মেটানোই ছিল চাষের প্রধান কাজ। নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় তুলনায় বড়ো শিল্প দেখা যেত। কাঁচামাল আমদানি এবং তৈরি মাল রপ্তানির সুবিধার জন্য নদীর ধারে শিল্পগুলি তৈরি করা হতো। বাংলা এবং গুজরাটে এই সুবিধা থাকায় সেখানে শিল্পাঞ্চল ছিল। দেশের শাসকরা চাষির ফসলের একটা মোটা অংশে ভাগ বসাত। তার বদলে সাধারণ লোকের শান্তিতে বাস করার ব্যবস্থা করে দিত প্রশাসন।

গাঙ্গেয় সমভূমিতে উৎপন্ন ফসলের মধ্যে আমের সবচেয়ে বেশি চাহিদা ছিল। আঙুর, খেজুর, জাম, কলা, কাঁঠাল, নারকেল প্রভৃতি ফলেরও চাষ হতো। নানা রকম ফুল, চন্দনকাঠ, ঘৃতকুমারী এবং নানা ভেষজ উদ্ভিদ ভারতে হতো। লঙ্কা, আদা এবং অন্যান্য মশলাও চাষ হতো। আর ছিল নানান গৃহপালিত পশুপাখি।

কৃষি-পণ্যকে ভিত্তি করে গ্রামে কারিগরী শিল্প চলত। চিনি এবং নানান সুগন্ধি আতর তৈরির শিল্প ছিল বিখ্যাত। এই শিল্পগুলি বংশগত ছিল। তাই পুরোনো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেও শিল্পদ্রব্যগুলির মান হতো অসাধারণ।

এই সময়ে চালু শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্প, ধাতুর কাজ, পাথরের কাজ, কাগজ শিল্প প্রভৃতি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। রাজমিস্ত্রি এবং পাথরের কাজে পটু কারিগরদের চাহিদা ছিল সর্বত্র। টালি ও ইটের ব্যবহার করে বাড়ি বানানোর পদ্ধতি চালু হয়েছিল বাংলা ও অন্যান্য অঞ্চলে।

রোজকার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম সবসময়ে সমান ছিল না। দেশে দুর্ভিক্ষ বা যুদ্ধ লাগলে খাদ্যশস্যের দাম বাড়ত। আবার জিনিসপত্রের খুব

১১২ নং পৃষ্ঠার ছবিগুলি ভালো করে দেখো। ছবিগুলিতে কারা কী কী কাজ করছে?

কম দামের নজির ছিল ইব্রাহিম লোদির রাজত্বকাল। একটা বহলোলি মুদ্রা (সুলতান বহলোল লোদির আমলে চালু) দিয়ে লোকে দশ মণ খাদ্যশস্য, পাঁচ সের তেল এবং দশ গজ মোটা কাপড় কিনতে পারত।

আলাউদ্দিন খলজি এবং মহম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে পণ্যদ্রব্যের দামের তুলনা করলে কি কোনো তফাত দেখা যাবে?

টুকরো কথা

প্রতি মণের দাম জিতলের হিসাবে

পণ্যদ্রব্য	আলাউদ্দিন খলজি	মহম্মদ বিন তুঘলক	ফিরোজ শাহ তুঘলক
গম	৭ ১/২	১২	৮
যব	৪	৮	৪
ধান	৫	১৪	—
ডাল	৫	—	৪
মসুর	৩	৪	৪
চিনি	১০০	৮০	—
ভেড়ার মাংস	১০	৬৪	—
ঘি	১৬	—	১০০

শোনা যায় মহম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে বাংলায় নাকি জিনিসপত্রের দাম ছিল খুব সস্তা। ইবন বতুতা বাংলায় জিনিসপত্রের দামের একটা তালিকা দিয়েছেন—

একটি মুরগি	১ জিতল
পনেরোটি পায়রা	৮ জিতল
একটি ভেড়া	১৬ জিতল
তিরিশ হাত লম্বা খুব ভালো কাপড়	২ তঙ্কা
চাল (প্রতি মণ)	৮ জিতল
একটি ছাগল	৩ তঙ্কা
চিনি (প্রতি মণ)	৩২ জিতল

সমাজ ছিল যৌথ পরিবারভিত্তিক। সমাজে এবং পরিবারে পুরুষদের তুলনায় নারীর স্থান ছিল নীচে। হিন্দু এবং মুসলমান সমাজে ঘোমটা এবং পর্দার প্রচলন ছিল। কিন্তু গরিব কৃষক পরিবারে, নারী-পুরুষকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংসার এবং খামারে পরিশ্রম করতে হতো। সেই সব ক্ষেত্রে মহিলাদের পর্দা বা ঘোমটার বিশেষ প্রচলন ছিল না।

সাধারণ গরিব জনগণের বসতির জন্য সামান্য কিছু উপকরণ লাগত। একটা পাতকুয়া, ডোবা বা পুকুর থাকলেই বসতি তৈরি করে নিতে পারত গ্রামের মানুষ। ঘর তোলার জন্য কয়েকটি গাছের গুঁড়ি, চাল ছাইবার জন্য কিছু খড়। এতেই তারা মাথা গোঁজবার ঠাঁই করে নিত।

সরকারি খাজনা ও নানা পাওনা মিটিয়ে ফসলের কিছু অংশ কৃষকের হাতে থাকত। সেটাই ছিল রোজকার ব্যবহারের সম্বল। বছরের কয়েকটি ঋতুতে কৃষক পরিবারগুলি দিন-রাত পরিশ্রম করত। কৃষকের দৈনন্দিন জীবন বিষয়ে অল্প তথ্য পাওয়া যায়। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গিরের সময়ের একজন ওলন্দাজ বণিক লিখেছেন যে, গরিবরা মাংসের স্বাদ প্রায় জানতই না। তাদের রোজের খাবার ছিল একঘেয়ে খিচুড়ি। তাই দিয়েই সারাদিনে একবার মাত্র বিকেলবেলায় তারা খালি পেট ভরাত। পরবার পোশাকও যথেষ্ট ছিল না। একজোড়া খাটিয়া ও রান্নার দু-একখানা বাসনই ছিল তাদের ঘর-গৃহস্থালি। বিছানার চাদর ছিল একটি বা বড়ো জোর দুটি। তাই তারা পেতে শুতো, দরকারে গায়ে দিত। গরমের দিনে তা যথেষ্ট হলেও দারুণ শীতে তাদের ভীষণই কষ্ট হতো। পালা-পার্বণে আনন্দ-উৎসব ছিল একঘেয়ে জীবনের মধ্যে একটু ব্যতিক্রম।

অন্যদিকে ভেবে দেখো, মুঘল সম্রাটরা ছিলেন অত্যন্ত ধনী। তাদের অভিজাতরা প্রচুর সম্পদের অধিকারী ছিলেন। দুর্গ, রাজপ্রাসাদ, মসজিদ, মাদ্রাসা ও তাজমহলের মতো স্থাপত্য নির্মাণের জন্য তারা বিপুল অর্থ খরচ করতেন। দামি পোশাক, অলংকার, নানা রকম বিলাস দ্রব্যের জন্য টাকা খরচ করতে তারা দু-বার ভাবতেন না।

সে যুগের খেলাধুলোর মধ্যে কুস্তি ছিল একটি জনপ্রিয় খেলা। অভিজাত, সাধারণ জনগণ এমনকী সাধু-সন্তরাও কুস্তির ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। তির-ধনুক, বর্শা ছোঁড়া ও সাঁতার জনপ্রিয় ছিল। বাংলায় বাঁটুল ছোঁড়া নামের একরকম খেলার কথা জানা যায়। লোকগান, নাচ, বাজিকর বা জাদুকরের খেলা, সং প্রভৃতি ছিল সাধারণ মানুষের আনন্দের উপকরণ।

দিল্লিতে এবং আঞ্চলিক রাজ্যগুলিতে শাসকের বদল ঘটেছে নানা সময়ে। কিন্তু, সুলতানি ও মুঘল যুগে দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা প্রায় একই রয়ে গেছে। হাড়ভাঙা পরিশ্রম আর অভাবের সংসার — সেযুগে ভারতের গরিব কৃষক, কারিগর, শ্রমিকের জীবন বলতে এটুকুই।

? এর থেকে তুমি সেযুগের সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে কী ধারণা করতে পারো?

টুকরো কথা

সেকালের সময় মাপা

দিন-রাতের সময় বোঝার জন্য সমস্ত দিন-রাত কে আটটি 'প্রহর' (ফারসিতে 'পাস')-এ ভাগ করা হতো। একেকটি প্রহর আজকের হিসাবে প্রায় তিনঘন্টা। আটটি প্রহর আবার ষাটটি 'ঘড়ি'তে (ঘটিকা) বিভক্ত ছিল। এক ঘড়ি সমান আজকের চব্বিশ মিনিট। প্রতিটি ঘড়ি আবার ষাটটি 'পল'-এ ভাগ করা ছিল। এইভাবে দিনরাত্রি মিলিয়ে হতো তিনহাজার ছশো পল। প্রহর ও ঘড়ির যথাযথ সময় বুঝে নেওয়া যেত পাঁজির সাহায্যে। জলঘড়ি দেখে সময় নির্ধারণ করা হতো। প্রধান শহরগুলিতে ঘন্টার আওয়াজ করে সময় কতো হলো তা জানান দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের আমলে এই কাজের জন্য আলাদা একটা দফতরই ছিল।

জীবন–জীবিকার নানা রকম : সুলতানি ও মুঘল যুগ

৭.২ নতুন লোকায়ত ধর্মীয় ভাবনা: ভক্তি ও সুফিবাদ

মধ্যযুগের ভারতে জীবনযাত্রার এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল ধর্ম। ভারতে সুলতানি আমলে ধর্ম নিয়ে নতুন কিছু ভাবনার কথা শোনা যায়। পুরোনো আমলের ব্রাহ্মণ্যবাদ, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম তখনও কায়েম ছিল। কিন্তু মানুষের মনের উপরে তাদের প্রভাব ধীরে ধীরে কমে আসছিল। এই অবস্থায় ভক্তিবাদ ও সুফিবাদের কথা শোনা যেতে থাকে। ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্কের উপর এই ধর্মপ্রচারকরা জোর দেন। এইরকমের চিন্তাধারা ছিল প্রথাগত ধর্মমতের একেবারে বাইরে।

ভক্তিবাদ

ভক্তিবাদের মূলে ছিল ভগবানের প্রতি ভক্তের ভালবাসা বা ভক্তি। এই ভক্তির দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল। একটি হলো ভগবানের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করা। অন্যটি হলো ঈশ্বরলাভের জন্য জ্ঞান বা যোগ ছেড়ে ভক্তের ভক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া। এই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যই প্রথমে দক্ষিণ ভারত এবং পরে উত্তর ভারতের ভক্তিবাদের মূল কথা হয়ে ওঠে।

ভক্তিবাদের উত্থানের কারণ কী ছিল? খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক নাগাদ উত্তর ভারতে হর্ষবর্ধনের পতনের পরে কয়েকজন রাজপুত রাজা ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। এদের সমর্থন করে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা। তখন রাজপুত এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে বোঝাপড়া গড়ে ওঠে। এর ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাইরে নতুন কোনো ধর্মভাবনা তখনকার উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠা পেতে পারেনি। তবে সে সময় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কিছু কিছু মানুষ ভক্তি নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিল। নাথপন্থী, যোগী ইত্যাদি ধর্মীয় গোষ্ঠীরা এর প্রমাণ। তাদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিতি পেয়েছিল দক্ষিণ ভারতের অলভার এবং নায়নার (বহুবচনে নায়নমার) সাধকরা। উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ার আগেই খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের গোড়ায় দক্ষিণ ভারতে এই সাধকদের হাত ধরেই ভক্তিবাদ জনপ্রিয় হয়েছিল।

ঐ সময় ব্রাহ্মণ্যধর্ম, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম মানুষের জীবনে অচল হয়ে পড়েছিল। কারণ এই ধর্মমতগুলি অযথা রীতিনীতির উপর জোর দিত বা চূড়ান্তভাবে অ-সাংসারিক জীবনযাপন করতে বলত। এতে না ছিল মানুষের আবেগের জায়গা, না ভালো থাকার চাবিকাঠি।

এরকম অবস্থায় সরল, সোজা তামিল ভাষায় নিজের ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা জানায় অলভার এবং নায়নার সাধকরা। এতে আকৃষ্ট হয় সাধারণ

মনে রেখো

মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণেরা বিভিন্নভাবে সমাজের অন্যান্য শ্রেণিদের সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারের উপর নানা নিষেধ আরোপ করত। অব্রাহ্মণদের না ছিল পবিত্র ধর্মীয়গ্রন্থ পাঠের স্বাধীনতা, না সমানভাবে মন্দিরে যাওয়ার অধিকার। অন্য জাতি বা বর্ণের মধ্যে একসঙ্গে খাওয়া বা বিয়ে করাও নিষিদ্ধ ছিল।

মানুষ। ক্রমে অবশ্য দক্ষিণের এই ভক্তিবাদও বাইরের রীতিনীতি এবং দেবতাপুজোকে বেশি প্রাধান্য দিতে থাকে। এর ফলে তারাও মানুষের থেকে দূরে সরে যায়। দক্ষিণের ভক্তিবাদ কখনোই সমাজে ব্রাহ্মণদের গুরুত্বকে খাটো করার ক্ষমতা রাখত না।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে দক্ষিণ থেকে ভক্তির এই ধারা পশ্চিম ভারত হয়ে ক্রমশ উত্তর এবং পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় তুর্কিরা উত্তর ভারত আক্রমণ করে। তাদের কাছে হেরে যাওয়ায় রাজপুত রাজাদের ক্ষমতা কমে আসে। তার সঙ্গেই কমে যায় তখনকার সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনে ব্রাহ্মণদের দাপট। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতকে নামদেব, জ্ঞানেশ্বর, তুকারাম, রামানন্দ, কবীর, নানক, শঙ্করদেব, চৈতন্যদেব, মীরাবাঈ প্রমুখ ভক্তিবাদের প্রচার শুরু করেন। ভারতবর্ষের নানাদিকে শোনা যেতে থাকে তাঁদের কথা, লেখা, কবিতা এবং গান।

ছবি ৭.১ : গুরু নানক

টুকরো কথা

গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ)

গুরু নানক ছিলেন মধ্যযুগের ভক্তি সাধকদের মধ্যে অন্যতম। কোনোরকম ভেদাভেদ না মেনে সমস্ত মানুষকে তিনি আপন করে নিয়েছিলেন। তাঁর সময়েই চালু হয় লঙ্গারখানা। সেখানে এক সঙ্গে সব ধরনের মানুষরাই খেতে বসতো। এটি শিখ গুরুদ্বারে বা ধর্মীয় স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। নানক নিজে কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে যাননি। তবে তাঁর দর্শন এবং বাণীর উপর নির্ভর করেই পরবর্তী কালে গড়ে ওঠে শিখ ধর্ম। এই ধর্মে দশজন গুরুর কথা বলা রয়েছে যাদের মধ্যে প্রথম ছিলেন গুরু নানক। এঁদের বাণী লিপিবদ্ধ রয়েছে শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে। তার নাম গুরুগ্রন্থসাহিব। এটি গুরুমুখি লিপিতে লেখা।

তবে এই সাধকদের ভক্তিচিন্তাধারায় যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। কিন্তু এঁদের সবার ভক্তি দর্শনের মূল কথা ছিল দুটি। একটি হলো কোনো ভেদাভেদ না করে সব মানুষের কাছে ঈশ্বরের বাণী পৌঁছে দেওয়া। অন্যটি হলো সমস্ত আচার ছেড়ে ভগবানকে নিজের মতো করে পাওয়া। এই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটির এক উজ্জ্বল উদাহরণ ছিলেন সাধিকা মীরাবাঈ (১৪৯৮-১৫৪৪খ্রিঃ)। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে রাজস্থানের একটি ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম ও মেওয়াড়ের শাসককুলে তাঁর বিয়ে হয়। তিনি তাঁর সাধিকা জীবনের অনেকটা সময়েই কাটিয়েছিলেন গুজরাটের দ্বারকায়। তিনি কখনোই সাংসারিক বন্ধনের মধ্যে আটকে থাকেননি। মীরাবাঈ তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ বা গিরিধারীর প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তিতে।

মীরাবাঈ রচিত পাঁচশোরও বেশী ভক্তিগীতি ভারতীয় সংগীত এবং সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। তেমনই একটি ভক্তিগীতি হলো—

‘মেরে তো গিরিধর গোপাল
দুসরা না কোঈ,
যাকে শির মোর মুকুট
মেরে পতি সোঈ...’

—আমার প্রভু গিরিধর গোপাল ছাড়া আর কেউ নয়। যাঁর শিরে (মাথায়) ময়ূরের পাখার মুকুট তিনিই যে আমার পতি।

মীরাবাঈয়ের উদাহরণ থেকে তোমরা কিন্তু ভেবে বসো না যে, তখনকার ভক্তিবাদে কেবল তথাকথিত উঁচুজাতের মানুষরাই বিশ্বাস করত। সাধকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন তথাকথিত নীচুজাতির। যেমন, সন্ত রামানন্দের শিষ্যদের মধ্যে ছিল জাতিতে চামার রবিদাস, নাপিত সাই বা কসাই সাধনা।

ছবি ৭.২ : মীরাবাঈ

টুকরো কথা

কবীর (১৪৪০-১৫১৮ খ্রিস্টাব্দ)

বারাণসীতে এক মুসলিম জোলাহা (তাঁতি) পরিবারে পালিত হন কবীর। তিনি ছিলেন খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের একজন বিখ্যাত ভক্তিসাধক। কেউ কেউ মনে করেন যে কবীর ছিলেন রামানন্দের একজন শিষ্য। ইসলামের একেশ্বরবাদের সঙ্গে বৈষ্ণব, নাথ-যোগী এবং তান্ত্রিক বিশ্বাসও এসে মিশেছিল কবীরের ভক্তিচিন্তায়। তাঁর কাছে সব ধর্মই ছিল এক, সব ভগবানই সমান। তাই কবীরের মতে রাম, হরি, গোবিন্দ, আল্লাহ, সাঁই, সাহিব ইত্যাদি ছিল এক ঈশ্বরেরই বিভিন্ন নাম। কবীর বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ তার ভক্তি দিয়ে নিজের মনেই ঈশ্বর খুঁজে পাবে। তার জন্য মন্দিরে-মসজিদে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তাই মূর্তি পুজো বা গঙ্গাস্নান বা নামাজ পড়া তাঁর কাছে ছিল অর্থহীন। তখনকার সামাজিক জীবনে কবীরের ভাবনার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তাঁর গান এবং দোহা শুনলে বোঝা যায় তিনি ধর্মের লোক-দেখানো আচারের বিরোধী ছিলেন।

হিন্দি ভাষায় দুই পংক্তির কবিতাকে বলে দোহা। কবীরের একটি দোহা হলো :

*‘জৈসে তিল মেঁ তেল হ্যায়
জিয়ু চক্‌মক্‌ মেঁ আগ
তেরা সাঁই তুঝ মেঁ হ্যায়,
তু জাগ সকে তো জাগ...’*

ছবি ৭.৩ : কবীর

—তিলের মধ্যে যেমন তেল আছে, চকমকি পাথরের মধ্যে যেমন আছে আগুন, তেমনি তোর ভগবান (সাঁই) তোর মধ্যে আছে। যদি ক্ষমতা থাকে তো জেগে ওঠ।

পাঁচশোরও বেশি কবীরের দোহা গুরুগ্রন্থসাহিবের অংশ। শিখ এবং অন্যান্য ধর্মের মানুষের কাছে কবীরের আসন দশজন শিখগুরুর পাশেই। কবীরের দোহার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে পাওয়ার কথা শুনত সাধারণ মানুষ। কারখানার মজুর, চাষি, গ্রামের মোড়ল— সবার মুখের ভাষাই ছিল দোহার ভাষা।

লোকমুখে শোনা যায় যে, কবীরের মৃত্যুর পর তাঁর হিন্দু এবং মুসলিম ভক্তরা কবীরকে হিন্দু মতে দাহ করা হবে না কি ইসলামীয় মতে গোর দেওয়া হবে তা নিয়ে চিন্তায় পড়ে। সে সময় কবীরের দেহ অদৃশ্য হয়। সেই জায়গায় পাওয়া যায় সাদা কাপড়ের উপর এক মুঠো লাল গোলাপ। এই ফুল দুই সম্প্রদায়ের ভক্তরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। গল্পের সত্য-মিথ্যা বিচার না করেও আমরা বুঝি কিভাবে তখনকার মানুষের মনে কবীর শান্তি এবং সাম্যের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন।

গুরুনানক ও কবীরের কথা সাধারণ মানুষ সহজে বুঝতে পারতেন। এর পিছনে কী কী কারণ ছিল বলে তোমার মনে হয়?

ছবি ৭.৪ :
গুরু নানক এবং কবীরের মধ্যে কাল্পনিক আলাপের দৃশ্য। এর থেকে বোঝা যায় যে শিখরা সন্ত কবীরকে শ্রদ্ধা করত।

সুফিবাদ

নিজের মতো করে ভগবানকে ডাকার ইচ্ছা কিন্তু হিন্দুধর্মের মানুষদের বা বৌদ্ধ সহজিয়াদের মধ্যেই সীমিত ছিল না। খ্রিস্টীয় দশম-একাদশ শতক থেকে বিভিন্ন ধর্মীয় আইন কানুনের বাইরে বহু মুসলমান ঈশ্বরকে নিজের মতো করে আরাধনা করার পথ খুঁজছিলেন। সুফিসন্তরা তাদেরকে এই পথ দেখায়।

সুফিদের আর্বিভাব মধ্য এশিয়ায়। আন্দাজ খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক থেকে তাঁরা ভারতে আসতে থাকে। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ দেশে সুফিবাদ যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অনেকের মতে, সুফি কথাটি আসে *সুফ* থেকে যার অর্থ আরবিতে পশমের তৈরি এক টুকরো কাপড়। বিশ্বাস করা হয় যে, এরকম কম্বল জাতীয় জিনিস গায়ে দিতেন সুফি সাধকরা, খ্রিস্টান সন্তরা এবং সন্ন্যাসীরা।

ভারতের মাটিতে সুফিবাদ যখন দানা বাঁধছিল সে সময়ে ভক্তিবাদ ছাড়াও নাথপন্থী ও যোগীরা তাদের ধর্ম প্রচার করেছিল। এই সবকটিই তখনকার প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুলির আচারসর্বস্বতার বিরুদ্ধে ছিল। তাই আন্দাজ করা যায় যে সুফি, ভক্তি এবং নাথপন্থী ধর্মীয় ধারণা একে অন্যকে প্রভাবিত করেছিল। যেমন মনে করা হয়, সুফিরা যে হঠযোগ অভ্যাস করত, তা তারা জেনেছিল নাথপন্থীদের কাছ থেকে। এ দেশে মূলত দুটি গোষ্ঠীর সুফিরা ছিল প্রভাবশালী। দিল্লি ও গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে চিশতি এবং সিন্ধু, পাঞ্জাব ও মুলতানে সুহরাবর্দিরা। ভারতে চিশতি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মইনউদ্দিন চিশতি। শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়া বা বখতিয়ার কাকি ছিলেন এই গোষ্ঠী বা সিলসিলার অন্যতম সাধক। চিশতি সুফিদের জীবন ছিল খোলামেলা। তাঁরা ধর্ম, অর্থ, ক্ষমতার মাপকাঠিতে মানুষকে বিচার করতেন না।

টুকরো কথা

পির ও মুরিদ

অনান্য বেশ কয়েকটি সহজিয়া ধারার মতো সুফিও ছিল একটি সাধন ধারা। সুফি সিলসিলাগুলির প্রধান ব্যক্তি হতেন কোনো একজন গুরুত্বপূর্ণ সাধক। তিনি তার শিষ্যদের সঙ্গে থাকতেন 'খানকা'য় বা আশ্রমে। সুফি ধারায় পির বা গুরু এবং মুরিদ অর্থাৎ শিষ্যের সম্পর্ক ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পিররা তাঁদের ধর্মভাবনা ও দর্শন দিয়ে যেতেন বেছে নেওয়া খলিফা বা উত্তরাধিকারীদের। সেটাই ছিল নিয়ম।

ছবি ৭.৫ : সুফি সাধক শেখ সেলিম চিশতির দরগা, ফতেহপুর সিকরি, উত্তরপ্রদেশ।

টুকরো কথা

সুফিদের জনপ্রিয়তা

সুফি সাধক কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি দিল্লিতে চিশতি মতবাদকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। এতে রেগে যায় গোঁড়া উলেমার দল এবং সুহরাবর্দিরা। কাকির বিরুদ্ধে আভিযোগ আনা হয় যে তিনি অ-ইসলামীয় আচার-আচরণ করেন। যেমন, তিনি 'সমা' বা সুফি 'কীর্তন' গান করেন। এর প্রতিবাদে বখতিয়ার কাকি যখন দিল্লি ছেড়ে শহরের বাইরে বেরোন, তখন নাকি হাজার হাজার মানুষ তাঁর সঙ্গে বহুদূর চলে আসেন। এই দেখে বখতিয়ার কাকি দিল্লি ফেরার সিদ্ধান্ত নেন।

ছবি ৭.৬ :
দরবেশ সাধকরা সাধনার জন্য একসঙ্গে জমায়েত হয়েছেন।

চিশতি সুফিরা রাজনীতি এবং রাজদরবার থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখত। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, রাজ্য পরিচালনার কাজে জড়িয়ে পড়লে কোনোভাবেই ঈশ্বরসাধনা সম্ভব নয়। অন্যদিকে সুহরাবর্দি সুফিরা অনেকেই দারিদ্র্যের বদলে আরামের জীবন বেছে নিয়েছিল। সুলতানের কাছ থেকে উপহার বা সাহায্য নিতে বা রাজ্যে ধর্মীয় উচ্চপদ গ্রহণ করতে সুহরাবর্দিদের কোনো সংকোচ হতো না। সুহরাবর্দি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বদরউদ্দিন জাকারিয়া এক সময় সুলতান ইলতুৎমিশের পক্ষ নেন।

তবে চিশতি হোক বা সুহরাবর্দি, মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজে এই সব সুফি সাধকদের অবদান ছিল প্রচুর। নিজেদের খোলামেলা জীবন এবং শান্তির বাণীর মধ্য দিয়ে তারা সর্বদা চেষ্টা করতেন সব মানুষকে এক সঙ্গে রাখতে। সুলতানি শাসনে বাস করা অ-মুসলমান মানুষরা সুফিদের এরকম মানবদরদী কথায় অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলেন। সহজিয়া ধর্ম (এ সম্পর্কে তোমরা আগে পড়েছো), ভক্তি, সুফি এবং আরো কিছু ধর্মমত তখনকার মানুষের কাছে একটা সরল বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল। তারা বোঝাতে পেরেছিল যে, ঈশ্বরলাভের উপায় একমাত্র মনের ভক্তি দিয়ে আরাধনা করা। সংস্কৃতির উপরেও এই ভক্তিসাধক এবং সুফিসন্তরা নিজেদের ছাপ রেখেছিল। এর প্রমাণ ভারতের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে আছে। দোহা, কবিতা, কীর্তন এবং নানান নৃত্যশৈলীতে (যেমন, মণিপুরী নৃত্য) সেই ছাপ আজও খুঁজে পাওয়া যায়।

টুকরো কথা

বা-শরা ও বে-শরা

সুফিরা ছিল প্রধানত দুই প্রকারের। 'বা-শরা' অর্থাৎ যারা ইসলামীয় আইন (শরা) মেনে চলত। এবং 'বে-শরা'— অর্থাৎ সেই সুফিরা যারা এই আইন মানতো না। ভারতে দুই মতাদর্শেরই সুফিরা ছিল। যাযাবর সুফি সম্প্রদায় কালানদার ছিল বে-শরা। চিশতি এবং সুহরাবর্দিরা ছিল বা-শরা।

৭.৩ শ্রীচৈতন্য ও বাংলায় ভক্তিবাদ : সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মে প্রভাব

খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকে বাংলায় ভক্তি আন্দোলনের প্রচার এবং প্রসার জোরদার হয় শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর সঙ্গীদের চেষ্টায়। বাংলায়, বিশেষত রাঢ় বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম আগে থেকেই ছিল। শ্রীচৈতন্য সেই বৈষ্ণবীয় ঐতিহ্য আর ভক্তিবাদের ভাবনাকে একাকার করে দেন। জাত-ধর্ম-বর্ণ এসব ভেদাভেদের বিরুদ্ধে বৈষ্ণব ভক্তির প্রচার একটা আন্দোলন হিসাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

নবদ্বীপ ছিল এই ধর্ম-আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। কেমন ছিল সেই সময়ের নবদ্বীপ? নগরের বাসিন্দাদের মধ্যে অব্রাহ্মণরাই সংখ্যায় বেশি ছিলেন। গ্রামের ছবিটি একই রকম ছিল।

ভেবে বলো

বৃন্দাবন দাস লিখেছেন যে, চৈতন্যের সময়ে নবদ্বীপে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বিভিন্ন পাড়ায় বাস করত। তাদের জীবিকা ছিল নানারকম। শাঁখারি, মালাকার, তাঁতি, গোয়ালা, গন্ধবণিক, তাম্বুলি, বাদ্যকর, সাপেকাটার চিকিৎসক, বণিকপ্রভৃতি। তখনকার নবদ্বীপের সামাজিক অবস্থা আর শ্রীচৈতন্যের ভেদাভেদহীন ভক্তি প্রচার— এই দুয়ের মধ্যে কি কোনো যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যায়?

চৈতন্যের জন্মের অনেক আগে থেকেই বাংলায় তুর্কি আক্রমণের ফলে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিল। হোসেনশাহি রাজত্বে শাসনকাজে ব্রাহ্মণদের প্রভাব কমে কায়স্থদের প্রতিপত্তি বেড়েছিল। তার পাশাপাশি শাসক-আমলাদের অত্যাচারও ছিল। এইসব অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তির উত্তর প্রচলিত হিন্দুধর্মে খুঁজে পায়নি সাধারণ গরিব মানুষ। ফলে, অনেকেই হিন্দু ধর্ম ছেড়ে তুলনায় উদার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত। এর পাশাপাশি, আগে থেকেই নানান ধর্ম ও বিশ্বাস সমাজে চালু ছিল। আকর্ষণ ছিল তান্ত্রিক সাধনার প্রতিও। মনসা, চণ্ডী, ধর্ম—এই তিন লৌকিক দেবদেবীর পুজোর চল ছিল।

তবে নবদ্বীপের পরিবেশে ভক্তিবাদের প্রচার সহজ ছিল না। ব্রাহ্মণ 'ভট্টাচার্য'-রা বৈষ্ণবদের প্রবল বিরোধিতা করত। ভক্তিবাদ ও বৈষ্ণবদের উপহাস করত।

শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর অনুগামীরা মাত্র একটি সামাজিক নীতি মেনে চলায় জোর দিয়েছিলেন। সেই নীতিকেই *ভক্তি* বলা হয়েছে। ভক্তি স্বতঃস্ফূর্ত। তার জন্য কোনো উদ্যোগ-আয়োজন লাগে না। সাধারণ জীবনযাপন এবং সহজসরল আচরণের উপরেই গুরুত্ব দিতেন শ্রীচৈতন্য। এতে কোনো আড়ম্বরের জায়গা ছিল না। চৈতন্যের উদার দৃষ্টিভঙ্গির জন্য বৈষ্ণব ভক্তির জনপ্রিয়তা বেড়েছিল।

টুকরো কথা

শ্রীচৈতন্যের ছবি

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত বইয়ের প্রমাণ ধরলে চৈতন্যের জন্ম ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দে। ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

চৈতন্যের ছবি নানা জায়গায় দেখা যায়। কিন্তু ঠিক কেমন দেখতে ছিল চৈতন্যকে শুধু লিখিত প্রমাণ আছে তার। তাও সেই লেখা অনেক পরের। ফলে, চৈতন্যের যে ছবি আজ দেখা যায়, চৈতন্য আসলে তেমন দেখতে ছিলেন কি না, তা জানা যায় না। গৌতম বুদ্ধ বা যিশু খ্রিস্টের ছবির ক্ষেত্রেও একই রকম কথা বলা যায়।

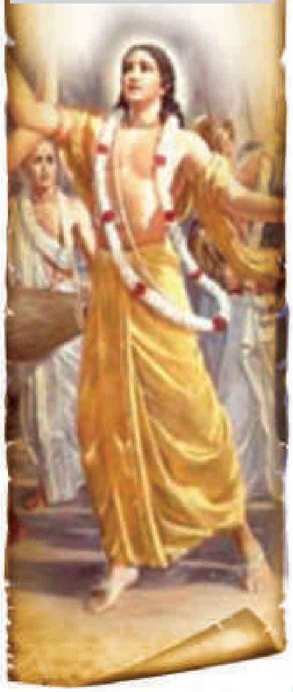

টুকরো কথা

শ্রীচৈতন্যের আহার

শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণের পরে প্রায় উপোস করে দিন কাটাতেন। ভক্তরাই মাঝে মধ্যে নানা রকম রান্না করে তাঁকে খাওয়াতে চাইতেন। এমনই এক খাওয়ার বিবরণ বেশ মজার। শাক, মুগের ডাল, বেশি করে ঘি-মাখা ভাত, পটোল ও অন্যান্য সবজির তরকারি, কচি নিমপাতা ভাজা, বেগুন, মোচার ঘন্ট, নারকেল, ঘন করে জাল দেওয়া দুধ, পায়েস, চাঁপাকলা, দই-দুধ দিয়ে চিঁড়ে আরও নানা কিছু। মজার ব্যাপার তরকারি রান্নায় বড়ির ব্যবহার হতো। আর আলুর ব্যবহার হতো না।

তবে চৈতন্য নিজে এত কিছু খেতেন না, ভক্ত এবং অনুচরদের খাওয়াতেন। কীর্তনিয়াদেরও খাওয়াতেন। আবার ক্ষুধার্ত মানুষদের ডেকে এনেও খাওয়াতেন। কখনওবা তিনি ভক্তদের সঙ্গে বনভোজনে যেতেন এমন কথাও শোনা যায়।

ভেবে বলো

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন—

"নীচ জাতি হৈলে নহে ভজনে অযোগ্য।
যেই ভজে সেই বড়ো অভক্ত হীন ছাড়।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতকুলাদি বিচার।।"

এর থেকে জাতপাতের প্রতি বৈষ্ণব-ভক্তি আন্দোলনের কীরকম দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ পাওয়া যায়?

চৈতন্যের বৈষ্ণব ভক্তি প্রচার এবং প্রসারের একটা পরিকল্পিত কাঠামো দেখা যায়। যেমন—

- চৈতন্যের নেতৃত্বে নবদ্বীপে যে বৈষ্ণবগোষ্ঠী সংগঠিত হয় তাতে জাতবিচার ছিল না।
- চৈতন্য ঘরে ঘরে নামগান প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তার সঙ্গে বিশাল শোভাযাত্রা করে নগরকীর্তনের ব্যবস্থা করেন।
- চৈতন্য নিজে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ হলেও, বিভিন্ন পেশার মানুষ এবং তথাকথিত নীচু জাতির মানুষদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ তৈরি করেছিলেন।
- কোনো প্রচলিত লোকধর্মের বিরোধিতা চৈতন্য করেননি। ভক্তি প্রচারকেই একমাত্র ধর্ম হিসাবে তুলে ধরেননি।
- নবদ্বীপে প্রভাবশালী জগাই-মাধাইয়ের অত্যাচারের বিরোধিতা করেন চৈতন্য এবং তাঁর অনুগামী নিত্যানন্দ। পাশাপাশি গোঁড়া ব্রাহ্মণদের প্রতিবাদ করেন তিনি। আবার কীর্তন-বিরোধী নবদ্বীপের কাজিকেও তর্কে হারিয়ে দেন। এভাবেই হিন্দু-মুসলমান শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করেন চৈতন্য এবং তাঁর অনুগামীরা।
- চৈতন্য বৈষ্ণবীয় নাটক অভিনয়ের উদ্যোগ নেন। নিজে তাতে অভিনয়ও করেন।
- ভক্তি সাধকরা সবাই জনগণের মুখের ভাষাতে প্রচার করতেন। চৈতন্যও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। বাংলা ভাষাতেই তিনি ভক্তি প্রচার করেন।

এই বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের ফলাফল কী ছিল?

খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিক থেকে বাংলায় ভক্তি আন্দোলনের প্রভাব কমতে থাকে। শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর অনুগামীরা জাতিভেদ না মানলেও সমাজে ভেদাভেদ থেকেই গিয়েছিল।

সবরকম ভেদাভেদ পুরো দূর করতে না পারলেও, সেগুলিকে তুচ্ছ করা যায়— একথা চৈতন্য জোর দিয়েই প্রচার করেন। সেকালের তুলনায় ভাবলে এইটিই এক বড়ো সাফল্য ছিল। তবে চৈতন্য এবং তাঁর ভক্তি আন্দোলনের সবচেয়ে গভীর প্রভাব পড়েছিল বাংলার সংস্কৃতিতে (**৭.৭.২ একক দেখো**)।

টুকরো কথা

কীর্তন

শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের আগেও কীর্তন গান ছিল। চৈতন্য সেই কীর্তনগানকে জনসংযোগের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেন। চৈতন্য দু-রকমের কীর্তন সংগঠিত করেন। নামকীর্তন ও নগরকীর্তন। নামকীর্তন ঘরে বসেই গাওয়া যেত। নগরকীর্তন নগরে শোভাযাত্রা করে ঘুরে ঘুরে গাওয়া হতো। কীর্তনে জাতবিচার ছিল না। নেচে নেচে, দু-হাত তুলে গান গেয়ে চলাই কীর্তনের বৈশিষ্ট্য ছিল। নামকীর্তন গাওয়া সবার পক্ষেই সম্ভব ছিল। কবি পরমানন্দ লিখেছিলেন—

“নাচিতে জানি না তবু নাচিয়া গৌরাঙ্গ বলি
গাইতে জানি না তবু গাই।”

কীর্তন ছাড়া কথকথার মাধ্যমেও ভক্তির ভাব প্রচার করা হতো।

বৈষ্ণবদের রচনায় সাধারণ মানুষের রোজকার জীবনের ছবিই ধরা পড়ে। বহু মুসলমান কবি বৈষ্ণবগান-কবিতা লেখেন। ঘাঁটু, ঘাঁটু-তেলেনা, পটুয়া, রাসলীলা, পৌষ-পার্বণ ইত্যাদির গানে আজও বৈষ্ণব প্রভাব লক্ষ করা যায়।

এভাবেই ভক্তির ভাবনাকে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেন শ্রীচৈতন্য। বাংলায় এক নতুন সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশ তৈরি হয় এর মধ্য দিয়ে। জ্ঞানের বদলে ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরলাভের উপরে জোর পড়েছিল।

বলা হতো : “জ্ঞানে কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোঁসাই।” অর্থাৎ জ্ঞানচর্চা বা উঁচুবংশে জন্ম দিয়ে কিছু হয় না। ভক্তির মাধ্যমেই চৈতন্য লাভ হয়।

টুকরো কথা

শ্রীচৈতন্যের জীবনী

শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করেই বাংলা ভাষায় জীবনী সাহিত্য লেখার ধারা বিকশিত হয়েছিল। চৈতন্যের জীবনীগুলির থেকে একদিকে সমকালীন সমাজ এবং অন্যদিকে ব্যক্তি চৈতন্যের বিষয়ে আমরা নানা কথা জানতে পারি।

ভেবে বলো তো, কেন শ্রীচৈতন্যকে দিয়েই বাংলায় জীবনী সাহিত্যের ধারা বিকশিত হয়েছিল?

টুকরো কথা

উত্তর-পূর্ব ভারতে ভক্তি আন্দোলন

ভক্তি আন্দোলনের একটি ধারা বিকশিত হয়েছিল উত্তর-পূর্ব ভারতের অসমে। এর নেতৃত্বে ছিলেন শ্রীমন্ত শঙ্করদেব। তিনি ছিলেন পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের মানুষ। এক কায়স্থ ভুঁইয়া পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। ভাগবত পুরাণের এক অংশ তিনি অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তিনি ছিলেন একেশ্বরবাদী এবং কৃষ্ণের উপাসক। তাঁর প্রচারিত ভক্তির মূল কথা ছিল 'নাম ধর্ম'। তিনি তাঁর অনুগামীদের কৃষ্ণের নাম গান ও সংকীর্তন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তবে তিনি রাধাকৃষ্ণের কাহিনির উপরে জোর না দিয়ে কৃষ্ণের বাল্যলীলাকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। শঙ্করদেব ছিলেন একজন দক্ষ সংগঠক। অনেক জায়গায় তিনি 'সত্র' (বৈষ্ণব ভক্তদের জমায়েত হওয়ার স্থান) গড়ে তুলেছিলেন। এর মধ্যে থাকত 'নাম ঘর' এবং 'কীর্তন ঘর'। তাঁর প্রচারিত ভক্তি ব্রহ্মপুত্র নদের দু-পাড়ে বসবাসকারী কৃষক, ছোটো ব্যবসায়ীদের মতো সমাজের নীচু তলার মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়েছিল। তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মূল সমস্যার কথা ধরা পড়ত এর মধ্যে। পরের শতকে ভক্তি আন্দোলনের ভিত অসমে আরও শক্ত হয়েছিল। ঐ সময়ে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় কয়েকটি পরিবর্তন ঘটেছিল। অহোম রাজারা মুঘলদের সঙ্গে লড়াই করে অসমকে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। কৃষিক্ষেত্রে ধান চাষের বিস্তার অর্থনীতিতে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। এই সময়ে শঙ্করদেবের ভক্তির আদর্শ অসমের সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে মাধবদেব এবং দামোদরদেব ছিলেন উল্লেখযোগ্য।

ছবি ৭.৭ : শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে বৈষ্ণবদের নগর সংকীর্তন।

৭.৪ দীন-ই ইলাহি

খ্রিস্টীয় ১৫৭০-এর দশকে বাদশাহ আকবর ক্রমশ সবার সামনে নামাজ পড়া ও অন্যান্য ইসলামীয় আচার পালন করা বন্ধ করে দেন। এর বদলে তিনি নিজের পছন্দ মতো কিছু প্রথা পালন করতে শুরু করেন। এক সময়ে দিনে চারবার তিনি সবার সামনে পূর্বদিকে মুখ করে সূর্যপ্রণাম করা এবং সূর্যের নাম জপ করা শুরু করেন। ফতেহপুর সিকরিতে তিনি প্রথমে ইসলাম ধর্ম নিয়ে উলেমার সঙ্গে আলোচনা করতেন। পরে তিনি নানান ধর্মের গুরুদের ডেকে ধর্মীয় নানা বিষয়ে আলোচনা করতে থাকেন। অবশেষে এইসব আলোচনার ভিত্তিতে তিনি দীন-ই ইলাহি নামে এক নতুন মতাদর্শ চালু করলেন।

এক সময়ে ভাবা হতো দীন-ই ইলাহি বুঝিবা বাদশাহ আকবরের প্রচলিত এক নতুন ধর্ম। কিন্তু, আকবর কখনো ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেননি। ইসলাম ধর্মের নানা ব্যাখ্যার মধ্যে থেকে তিনি সবচেয়ে যুক্তিগ্রাহ্য মতটি মেনে নিতেন। নানা ধর্মের গুরুদের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি বিভিন্ন ধর্ম থেকে নিজের পছন্দ মতো কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বেছে নিতেন। সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভিত্তি করে আকবর দীন-ই ইলাহি তৈরি করেন। তিনি এর প্রচলন করেছিলেন নিজের সভাসদদের মধ্যে। কিন্তু, এখন এই সম্বন্ধে ধারণা অনেকটা পালটে গেছে। এখন মনে করা হয় যে, দীন-ই ইলাহি আসলে ছিল আকবরের প্রতি চূড়ান্ত অনুগত কয়েকজন অভিজাতদের মধ্যে প্রচারিত এক আদর্শ। আকবর নিজে তাঁদের বেছে নিতেন। বেশ কিছু অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির মধ্যে দিয়ে তাঁরা বাদশাহের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত থাকার শপথ নিত। এই হলো দীন-ই ইলাহি।

এইভাবে, আকবর নিজের চারপাশে গড়ে তুললেন বিশ্বস্ত অনুগামীদের একটি দল। একেকজন সদস্যের ছিল একেক ধর্ম। তাঁরা কেউ পারস্যদেশের লোক, কেউ হিন্দু রাজপুত, আবার কেউ বা ভারতীয় মুসলমান। দীন-ই ইলাহি কোনো আলাদা ধর্ম ছিল না।

আকবরের পুত্র জাহাঙ্গিরও দীন-ই ইলাহি চালু রাখেন। তাঁর এক সেনাপতি মির্জা নাথান, যিনি বাংলা ও আসামে বহুকাল যুদ্ধ করেন, 'ইলাহি'-তে নিজের দীক্ষিত হওয়ার ঘটনার কথা লিখে গিয়েছেন নিজের আত্মজীবনীতে।

টুকরো কথা

দীন-ই ইলাহির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান

যিনি দীন-ই ইলাহি গ্রহণ করতেন, তিনি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের শুরুতে তার জীবন (জান), সম্পত্তি (মাল), ধর্ম (দীন) ও সম্মান (নামুস) বিসর্জন (কুরবান) দেওয়ার শপথ নিতেন। শিষ্য (মুরিদ) যেমন তার সুফি গুরুর (পির) পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে, তাঁকেও তেমনই বাদশাহের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে হতো। এরপর অনুষ্ঠান শেষ হলে বাদশাহ তাকে দিতেন একটি নতুন পাগড়ি, সূর্যের একটি পদক ও পাগড়ির সামনে লাগাবার জন্য তাঁর (বাদশাহের) নিজের ছোটো একটি ছবি।

টুকরো কথা

টমাস রো-এর বিবরণে দীন-ই ইলাহি

মুঘল রাজসভায় আসা প্রথম ইংরেজ দূত টমাস রো-কেও সম্ভবত জাহাঙ্গির দীন-ই ইলাহিতে শামিল করেন। ভিনদেশ থেকে আসা দূতটি কিছু না জেনেই দীন-ই ইলাহি-তে প্রবেশ করার অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে ফেলেন। টমাস রো-এর লেখায় তাঁর সঙ্গে বাদশাহের এই মুহূর্তটির একটি মজার বিবরণ পাওয়া যায় :

আমি বাদশাহের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমি ঢোকামাত্র তিনি... আসফ খানকে একটি সোনার হার দিলেন। হারটিতে সোনার জলে আঁকা বাদশাহের নিজের একটি ছবি ও একটি মুক্তো লাগানো ছিল। তিনি আসফ খানকে নির্দেশ দিলেন যে [তিনি যেন হারটি আমাকে দেন, তবে] আমি যেটুকু সম্মান তাঁকে দেখাতে চাই, তার বেশি যেন তিনি আমার থেকে দাবি না করেন। এদেশের প্রথা অনুযায়ী বাদশাহ কাউকে কিছু দিলে সেই লোকটিকে হাঁটু গেড়ে বসে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তাঁকে সম্মান জানাতে হয়।... এরপর আসফ খান হারটি নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলে আমি হাত বাড়িয়ে সেটি নিতে গেলাম; কিন্তু তিনি ইশারায় আমাকে আমার টুপি খুলতে বললেন। [টুপি খোলার পর] আমার গলায় হারটি পরিয়ে দিয়ে তিনি আমাকে বাদশাহের সামনে নিয়ে গেলেন। আমার কী করণীয় বুঝতে পারলাম না, তবে সন্দেহ হলো যে, তিনি চান যে আমি ও দেশের প্রথা অনুযায়ী সিজদা করি [অর্থাৎ ঐভাবে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বাদশাহকে সম্মান দেখাই]। কিন্তু আমি তা না করে আমার আনা উপঢৌকন বাদশাহকে এগিয়ে দিলাম। আসফ খান আমাকে বাদশাহকে ধন্যবাদ জানাতে নির্দেশ দিলেন। আমি আমার নিজের দেশের প্রথা মেনে ধন্যবাদ জানালাম। তাই দেখে কয়েকজন সভাসদ আমাকে সিজদা করতে বললেন, কিন্তু বাদশাহ ফারসিতে তাঁদের জোর করতে নিষেধ করলেন। আমাকে তিনি নানা কথা বলে ফেরত পাঠালেন; আমি এরপর নিজের ঘরে ফিরে এলাম।

টমাস রো-র বিবরণ পড়ে বাদশাহ জাহাঙ্গিরের সম্পর্কে তোমার কী ধারণা হয়?

এখানে মনে রেখো যে, তাঁর আগের বেশিরভাগ সুলতান বা বাদশাহের থেকে আকবরের রাজত্বের ধর্মীয় চরিত্র ছিল আলাদা। গোঁড়া ইসলামের ছায়া থেকে তিনি বেরিয়ে আসেন ১৫৭০-এর দশক নাগাদ। মৌলবি বা উলেমার কথামতো তিনি রাজ্য চালাতে চাননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতবর্ষে বহু ধর্ম এবং জাতির মানুষের বসবাস। সেখানে নিজের শাসন সুদৃঢ় করতে গেলে কোনো একটি ধর্মের বুলি আউড়ালে চলবে না। নিজেকে এবং নিজের শাসনকে সবার কাছে মান্য করে তুলতে গেলে বিভিন্ন ধর্ম থেকে নানা আচার-প্রথা গ্রহণ করতে হবে। এই বোধ থেকেই আকবর সূর্যপ্রণাম, সূর্যের নাম জপ, প্রাসাদের *ঝরোখা* (জানালা) থেকে সভাসদ এবং প্রজাদের দর্শন দেওয়া ইত্যাদি নানা প্রথা চালু করেন। দীন-ই ইলাহির প্রথাগুলি ইসলামের রক্ষণশীল ব্যাখ্যাকারদের চোখে ছিল 'ইসলামবিরোধী'। কিন্তু, এই প্রথাগুলির মাধ্যমে আকবর ইসলামের গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে রাজপুত এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর কাছেও নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তোলেন।

৭.৫ সুলতানি ও মুঘল স্থাপত্য

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে উত্তর ভারতে দিল্লি সুলতানি শাসন শুরু হয়। সুলতানরা দিল্লি আর অন্য নানা জায়গায় অনেক স্থাপত্য তৈরি করেন। ঘর-বাড়ি, প্রাসাদ, মিনার , মন্দির-মসজিদ এসবকে স্থাপত্য বলে। এগুলি বানানোর কারিগরিকে স্থাপত্য শিল্প বলা হয়।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের অনেক আগেই ভারতে আরবি স্থাপত্যের চিহ্ন রয়েছে। দিল্লি সুলতানির আগে তৈরি মসজিদের ভাঙা অংশের খোঁজ পাওয়া গেছে গুজরাটে। এর থেকে বোঝা যায় ইসলামীয় স্থাপত্যশিল্প ভারতে সুলতানির আগেই এসেছিল। এই স্থাপত্যের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল খিলান এবং গম্বুজ।

তবে সুলতানি শাসন জারি হওয়ার পরেই ভারতীয় ও ইসলামীয় শিল্প মিলেমিশে যেতে পেরেছিল। এই দুই শিল্পধারা মিশেই তৈরি হয় ইন্দো-ইসলামীয় শিল্পরীতি। সুলতানরা যে দেশের শাসক, তারা যে ক্ষমতাবান সেটা বোঝানোর দরকার ছিল। আর তাই তারা বড়ো বড়ো স্থাপত্য বানান। সুলতানরাও সে বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ধর্মচর্চার জন্য মসজিদ, মিনার, পড়াশোনার জন্য মাদ্রাসা, থাকার জন্য প্রাসাদ, দুর্গ এসব বানানো শুরু হলো। সুলতানরা বা তাঁর আত্মীয় বা অভিজাত কেউ মারা গেলে তাদের স্মৃতিতে সৌধ, মিনার বানানো হতো। মাঝে মধ্যে সুলতানরা নিজেদের জীবনকালেই নিজেদের সমাধি সৌধের মূল কাঠামোটি তৈরি করে রাখতেন। সব স্থাপত্যের গায়েই লেগেছিল শিল্পের ছোঁয়া। সুন্দর কারুকার্যে মুড়ে দেওয়া হয়েছিল স্থাপত্যগুলি।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়ের পর কুতুবউদ্দিন আইবক কুয়াত-উল ইসলাম মসজিদ বানাতে শুরু করলেন। এদেশের লোক যাতে তাঁকে শাসক বলে মেনে নেয় তার জন্য এটি দরকার ছিল। আশপাশের সাতাশটি হিন্দু এবং জৈন মন্দিরের ভাঙা অংশ এই মসজিদ বানানোর কাজে ব্যবহার হয়। তাই এই মসজিদে হিন্দু, জৈন এবং ইসলামীয় স্থাপত্য শিল্পের মিলমিশ নজর টানে। এই মসজিদের মিনারটি হলো কুতুব মিনার। এই মিনার সুলতানি শাসনের প্রতীক হয়ে উঠল। কুতুবউদ্দিন মারা যাওয়ার পর মিনারটি বানানোর কাজ শেষ করেন সুলতান ইলতুৎমিশ। ইলতুৎমিশের নিজের জন্য বানানো সমাধি সৌধটি এই যুগের আরেকটি চমৎকার স্থাপত্য।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজির আমলে তৈরি হয় আলাই দরওয়াজা। এটি ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্যশিল্পের অসাধারণ নমুনা। লাল বেলে পাথরের তৈরি এই 'দরওয়াজা' যেন সুলতান হিসাবে আলাউদ্দিনের ক্ষমতার প্রতিফলন

ছিল। দরওয়াজার গায়ে আল্লাহ্-র কথা নয়, খোদাই করা হয়েছিল সুলতানের প্রশংসা। এমন কাজের নমুনা সে যুগে বিরল। এটিও ছিল ওই কুতুব-চত্বরেই। কুতুব মিনার, ইলতুৎমিশের সমাধি, আলাই দরওয়াজা—সব মিলিয়ে কুতুব-চত্বর হয়ে উঠল সুলতানি স্থাপত্যের নজির।

তুঘলক সুলতানরা নগর বা শহরের পরিকল্পনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন। মহম্মদ বিন তুঘলকের দৌলতাবাদের দুর্গ-শহরে তেমন পরিকল্পনার ছাপ দেখা যায়। ফিরোজ শাহ তুঘলকের ফিরোজাবাদও তার ব্যতিক্রম নয়। সমাধি সৌধ বানানোর প্রতিও তুঘলক সুলতানরা মনোযোগী ছিলেন। যেমন, দিল্লির তুঘলকাবাদে গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের সমাধি। খাড়া দেয়ালের বদলে গম্বুজ-বসানো ঢালু দেয়াল ছিল এর বৈশিষ্ট্য।

ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্যরীতিতে লোদি সুলতানদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল আটকোণা সমাধি সৌধগুলি। চওড়া বাগানঘেরা চত্বরে এই সমাধি সৌধগুলি তৈরি করা হয়েছিল। চত্বরগুলির প্রবেশ পথে তৈরি করা হয়েছিল বড়ো দরওয়াজা।

অতএব, মুঘলরা যখন ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল তার আগেই দিল্লি সহ ভারতের নানা অঞ্চলে ইন্দো-ইসলামীয় ধারায় স্থাপত্য তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

ছবি ৭.৮ : কুতুব মিনার এবং আলাই দরওয়াজা, দিল্লি।

আলাই দরওয়াজার খিলান এবং গম্বুজ লক্ষ করো।

ছবি ৭.৯ : সুলতান ইলতুৎমিশের সমাধি, কুতুব-চত্বর, দিল্লি

স্থাপত্যশিল্পের বিরাট বদল হয় মুঘল শাসনের সময়ে। মুঘল সম্রাটরা প্রায় সবাই স্থাপত্যশিল্পের সমঝদার ছিলেন। নানান স্থাপত্যরীতির সহজ মেলামেশার ছাপ মুঘল স্থাপত্যে দেখা যায়।

সম্রাট বাবরের ছিল বাগানের খুব শখ। চারভাগে ভাগ করা একরকম সাজানো বাগান মুঘল আমলে বানানো হতো। তাকে 'চাহার বাগ' বলে। হুমায়ুনের আমলে দীন পনাহ শহরটি বানানো শুরু হয়। আফগান শাসক শের শাহ সাসারাম এবং দিল্লিতে কয়েকটি সৌধ বানিয়ে ছিলেন। সাসারামে তাঁর নিজের জন্য বানানো সমাধি সৌধটি যেন তাজমহলের পূর্বসূরি।

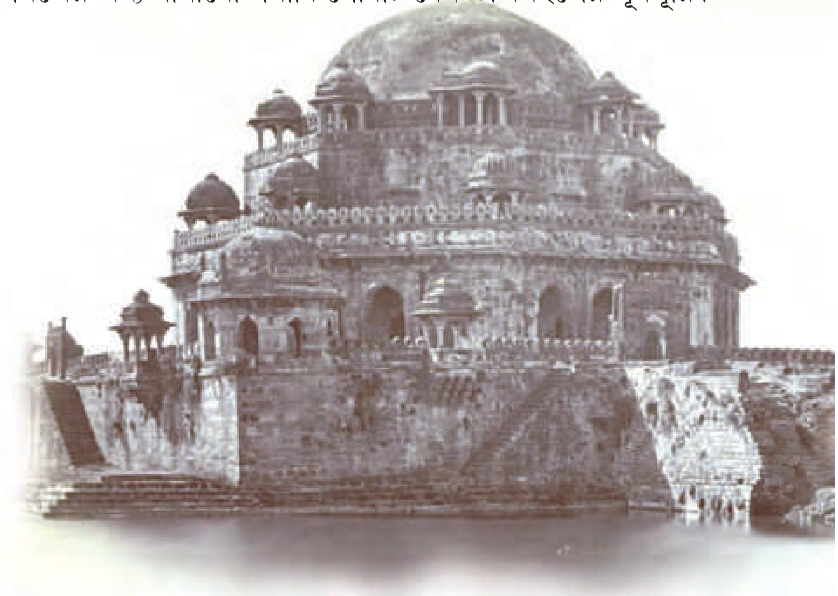

ছবি ৭.১০ : শেরশাহর সমাধি সৌধ, সাসারাম, বিহার

মুঘল স্থাপত্যশিল্পের প্রসার শুরু হয় সম্রাট আকবরের সময় থেকে। ভারতে মুঘল শাসনের প্রসার এবং স্থাপত্য বানানোর কাজ আকবর একসঙ্গে করেছিলেন। দুর্গ-শহর, প্রাসাদ বানানোয় আকবর মনোযোগী ছিলেন। এতে একদিকে সাম্রাজ্য সুরক্ষিত হয়েছিল, অন্যদিকে স্থাপত্যশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। আগ্রা দুর্গ এর অন্যতম উদাহরণ। আজমির, লাহোর, কাশ্মীর, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে দুর্গ (গড়) গুলিও আকবরের সময়ে তৈরি করা হয়। গুজরাট জয়ের স্মৃতিতে আকবর বানিয়েছিলেন বুলন্দ দরওয়াজা।

ফতেহপুর সিকরি এবং তার প্রাসাদ, মসজিদ, মহল, দরবার আকবরের স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ নমুনা। *ফতেহ্* মানে জয়। জয়ী সম্রাট হিসাবে আকবর ধ্বংস করেননি। বরং উদার মন আর সৌন্দর্যবোধ নিয়ে তৈরী করেছেন ফতেহপুর সিকরি। ভারতের নানা প্রদেশের স্থাপত্যরীতি মিশে গেছে সিকরিতে। আকবর যে সমস্ত ভারতের সম্রাট, কোনো বিশেষ ধর্ম, জাতি বা অঞ্চলের শাসক নন — তারই নমুনা ফতেহপুর সিকরি।

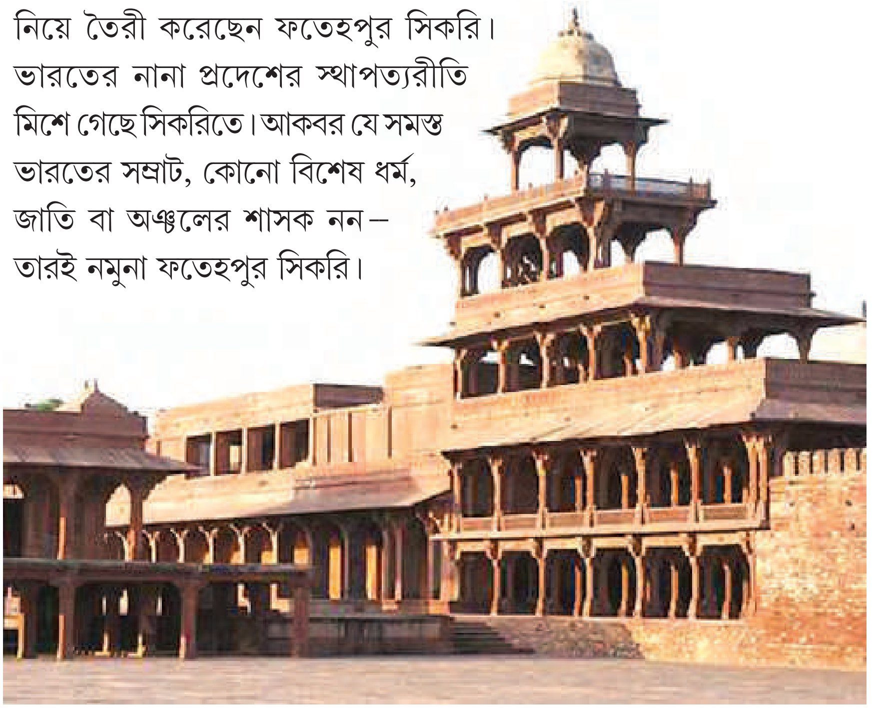

ছবি ৭.১১: ফতেহপুর সিকরির পঞ্চমহল বা বাদ্গির

জাহাঙ্গিরের সময়ে বাগান বানানোর উদ্যোগ আবার শুরু হয়। আগ্রায়, কাশ্মীরে বানানো বাগানগুলির কথা সম্রাট জাহাঙ্গির লিখেছেন তাঁর আত্মজীবনী *তুজুক-ই জাহাঙ্গিরি* বইতে। এই সময়ে শ্বেতপাথরে রত্ন বসিয়ে একরকম কারুকার্য করার চল দেখা যায়। তাকে *পিয়েত্রা দুরা* বলে। জাহাঙ্গিরের সময়ে বানানো ইতিমাদ-উদ্ দৌলার সমাধি সৌধে পিয়েত্রা দুরা কারুকার্যের ব্যবহার দেখা যায়।

ছবি ৭.১২:
একটি মুঘলরীতির চাহার বাগ

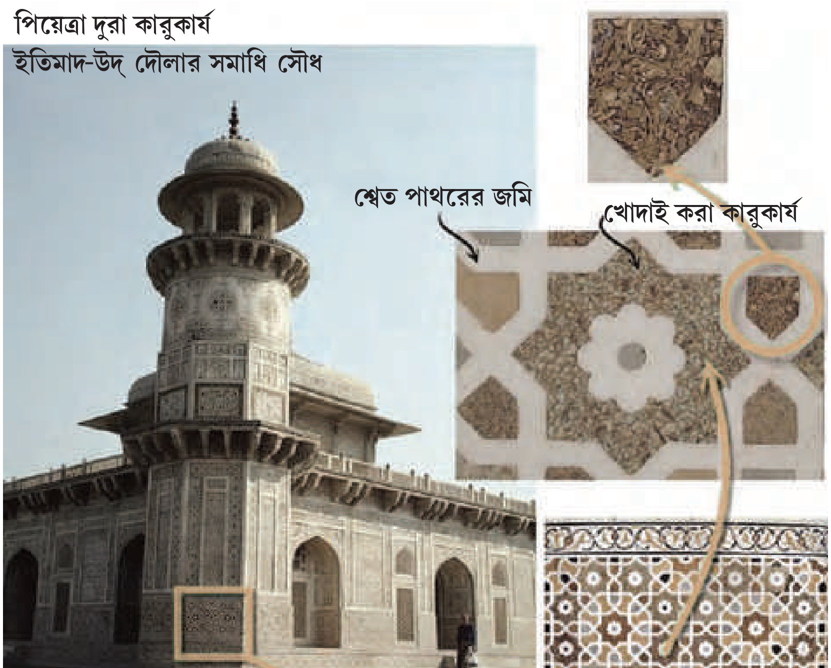

ছবি ৭.১৩:
ইতিমাদ-উদ্ দৌলা-র সমাধি সৌধ, আগ্রা।

মুঘল স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ তাজমহল। সম্রাট শাহ জাহানের সময়ে বানানো এই স্মৃতিসৌধটি এক আশ্চর্য স্থাপত্য। পাথরের ব্যবহার, কারুকার্য, শিল্পরীতির দিক থেকে তাজমহলের তুলনা নেই। তার পাশাপাশি লালকেল্লা, জামি মসজিদ এবং আগ্রা দুর্গের ভিতরে মোতি মসজিদ প্রভৃতি শাহজাহানের সময়ে স্থাপত্যশিল্পে উন্নয়নের সাক্ষী।

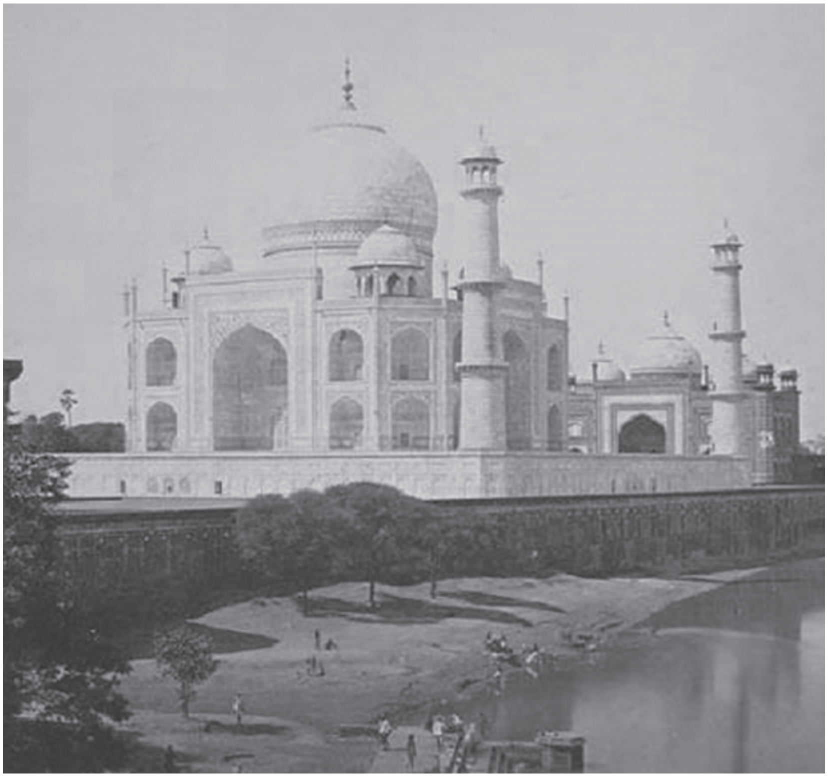

ছবি ৭.১৪ :
তাজমহল, আগ্রা

ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে সাম্রাজ্যের মধ্যে নানান বিদ্রোহ দেখা দেয়। সেইসব সামলাতে জেরবার বাদশাহ স্থাপত্য বানানোর দিকে মন দিতে পারেননি। তা ছাড়া যুদ্ধের জন্য খরচ অনেক বেড়ে যায়। তাই স্থাপত্যের জন্য বেশি অর্থ বরাদ্দ করাও সম্ভব ছিল না। তবে, ঔরঙ্গজেবের সময়ে লালকেল্লার ভিতরে একটি মসজিদ বানানো হয়। দাক্ষিণাত্যে ঔরঙ্গাবাদে তাঁর বেগমের স্মৃতিতে নির্মিত বিবি-কা মকবারা ঐ সময়ের বিখ্যাত স্থাপত্যশিল্প।

মুঘল স্থাপত্যরীতির প্রভাব গোটা দেশ জুড়েই লক্ষ করা যায়। খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকের অনেক আঞ্চলিক স্থাপত্যশিল্পেও সেই ছাপ স্পষ্ট।

দিল্লির সুলতান ও মুঘল বাদশাহদের সময়ের তৈরি স্থাপত্যগুলির একটি তালিকা তৈরি করো।

ছবি ৭.১৫:
মোতি মসজিদ, লালকেল্লা, দিল্লি। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত প্রার্থনার জন্য এই মসজিদটি বানানো হয়েছিল।

আঞ্চলিক স্থাপত্য

সুলতানি এবং মুঘল যুগে ভারতের নানা অঞ্চলে স্থাপত্যশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। আঞ্চলিক শিল্পগুলির মধ্যে গুজরাট, বাংলা এবং দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্যশিল্প বিখ্যাত।

গুজরাটের স্থাপত্যগুলি সাংস্কৃতিক মিলমিশের নিদর্শন। এতে ইসলামীয়, হিন্দু এবং জৈন নির্মাণশৈলীর স্পষ্ট ছাপ দেখা যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আহমেদাবাদের জামি মসজিদ।

দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্যের প্রধান দিক হলো একাধিক দুর্গ ও দুর্গ-শহর। গুলবর্গা দুর্গ (১৩১৮ খ্রিঃ) এর অন্যতম উদাহরণ। বিদরের দুর্গ ও প্রাসাদগুলিতে ইরানি ধাঁচের দেয়ালচিত্র দেখা যায়। যদিও এদের অধিকাংশই এখন ভেঙে গেছে। তবে পালিশ করা চুনের দেয়ালে সোনালি, লাল ও নীল রং-এর অপূর্ব সব খোদাই কাজ এখনও বর্তমান। আহমেদনগরের চাঁদ বিবির প্রাসাদ একটি টিলার উপর আটকোণা ভিত্তির উপর নির্মিত। বিজাপুরে মহম্মদ আদিল শাহ (১৬২৭-'৫৬ খ্রিঃ) নির্মিত গোল গুম্বদ একটি সুন্দর স্থাপত্যকার্য। এর গম্বুজটি ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড়ো গম্বুজ। কুতুবশাহি আমলের হায়দরাবাদের চারমিনার (১৫৯১খ্রিঃ) আঞ্চলিক স্থাপত্যের চমৎকার নিদর্শন।

ছবি ৭.১৬ :
চারমিনার, হায়দরাবাদ

ছবি ৭.১৭ :
গোল গুম্বদ, বিজাপুর

ছবি ৭.১৮ :
বিঠল মন্দিরের পাথরের রথ,
হাম্পি, বিজয়নগর

বিজয়নগরের রাজধানী হাম্পি সমেত বহু জায়গাতেই মন্দির এবং ইমারতগুলিতে দেখা যায় হিন্দু এবং ইসলামীয় স্থাপত্যরীতির মেলামেশা। কল্পনাশক্তি, কারুকার্য ও শৈলীর দিক দিয়ে এগুলি অতুলনীয়।

বাংলার স্থাপত্যরীতি

মুসলমান শাসন বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে। এই সময়ে বাংলায় কাঠামো নির্মাণের মূল গঠনভঙ্গি ছিল ইসলামি রীতি অনুসারে। আর বাইরের কারুকার্য ও কাঁচামাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলার লৌকিকরীতির ছাপ দেখা যায়।

ইমারতে ইটের ব্যবহার বাংলার স্থাপত্যরীতির একটি বৈশিষ্ট্য। বাড়ি এবং বেশির ভাগ মন্দির ঢালু ধাঁচে তৈরি করা হতো। এর পিছনে যুক্তি ছিল বেশি বৃষ্টিতে জল দাঁড়াতে পারবে না। এই বিশেষ নির্মাণ পদ্ধতির নাম *বাংলা*। অঞ্চলের নামেই স্থাপত্যরীতির নাম হওয়ার এটা একটা উদাহরণ। পুরোনো অনেক মন্দিরের কাঠামো এই ধাঁচেই তৈরি হতো। এমনই দুটি কাঠামো পাশাপাশি জুড়ে দিলে তাকে *জোড়-বাংলা* বলা হতো।

তোমাদের অঞ্চলে কোনো পুরানো স্থাপত্য আছে? থাকলে বন্ধুরা মিলে সেখানে যাও। সেটা কবে তৈরি, কেমনভাবে তৈরি সেসব বিষয়ে ভালো করে জানো। সেসব খাতায় লিখে রাখো ও স্থাপত্যটির একটি ছবি আঁকো।

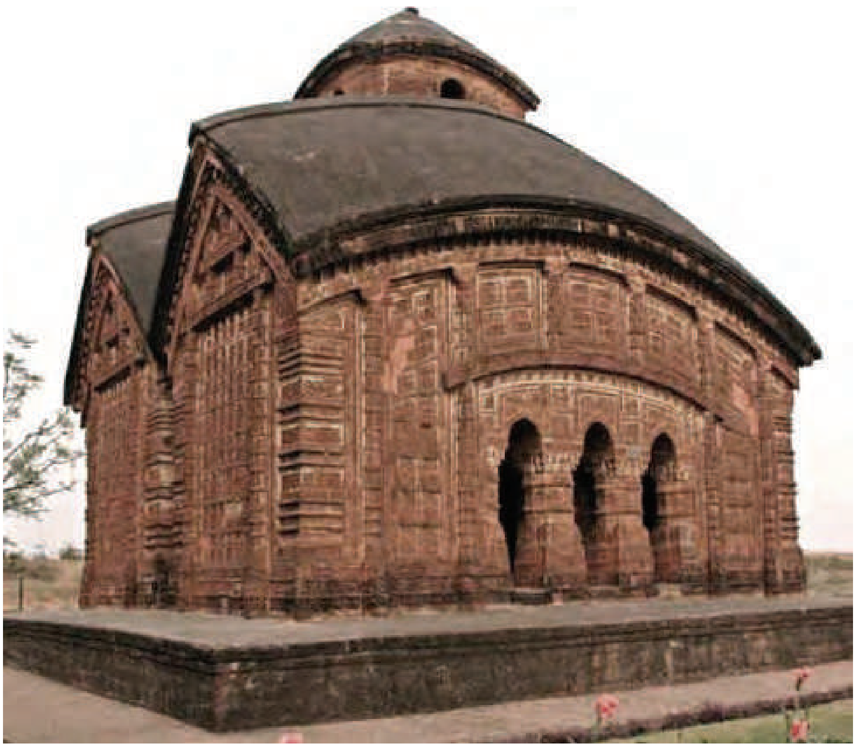

ছবি ৭.১৯ : জোড়-বাংলা মন্দির, বিষ্ণুপুর (১৬৫৫খ্রিঃ)

চাল বা চালাভিত্তিক মন্দির বানানোর রীতিও বাংলায় দেখা যায়। মন্দিরের মাথায় ক-টি চালা আছে, সে হিসাবেই কোনও মন্দির একচালা, কখনো দো-চালা, কখনো বা আট-চালা হতো। ইসলামীয় স্থাপত্যের ধাঁচে চালা গুলির মাথায়ও মাঝে মধ্যেই খিলান, গম্বুজ বানানো হতো।

সাধারণ আয়তক্ষেত্রাকার কাঠামোর উপর একাধিক চূড়া দিয়ে তৈরি মন্দিরও এই সময় বাংলায় বানানো হয়। সেই গুলির নাম *রত্ন*। একটি চূড়া থাকলে সেটি একরত্ন মন্দির, পাঁচটি চূড়া থাকলে পঞ্চরত্ন মন্দির।

এই মন্দিরগুলির বেশির ভাগের দেয়ালে পোড়ামাটির বা *টেরাকোটার* কাজ করা হতো। পোড়ামাটির তৈরি এই মন্দিরগুলি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ছাড়াও বাংলার নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে।

এই যুগের বাংলার স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসকে তিনটি মূল পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে (১২০১-১৩৩৯ খ্রিঃ) বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়। ত্রিবেণীতে জাফর খানের সমাধির ভগ্নাবশেষ, এবং বসিরহাট-এ ছড়িয়ে থাকা কিছু স্তূপ ছাড়া এসময়কার কোনও স্থাপত্যই আজ আর নেই।

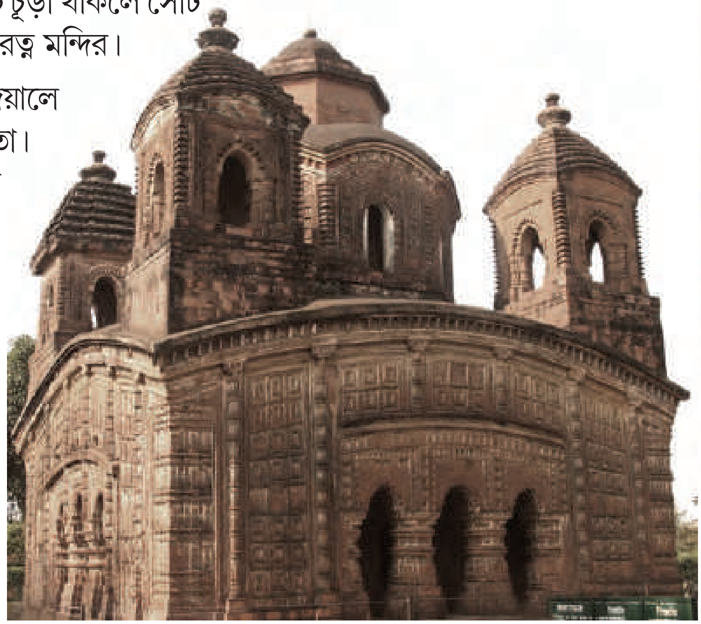

ছবি ৭.২০ : পঞ্চরত্ন মন্দির, বিষ্ণুপুর (১৬৪৩খ্রিঃ)

দ্বিতীয় পর্যায়ের (১৩৩৯-১৪৪২ খ্রিঃ) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য হলো মালদহের পাণ্ডুয়ায় সিকান্দর শাহের বানানো আদিনা মসজিদ। এ ছাড়া, হুগলি জেলায় ছোটো-পাণ্ডুয়ার মিনার ও মসজিদ এবং গৌড়ের শেখ আকি সিরাজের সমাধি এই পর্যায়ের আরও কিছু উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য।

তৃতীয় পর্যায়ে (১৪৪২-১৫৩৯ খ্রিঃ) বাংলায় ইন্দো-ইসলামি রীতির স্থাপত্য শিল্প সবচেয়ে উন্নত হয়। পাণ্ডুয়ায় সুলতান জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহর (যদু) সমাধি (একলাখি সমাধি নামে বিখ্যাত) এই ধাঁচের সেরা নিদর্শন। উচ্চতায় খুব বেশি না হলেও, টেরাকোটার গম্বুজ ও তার অর্ধগোল আকৃতির জন্য এটি বাংলায় ইন্দো-ইসলামি স্থাপত্যের উন্নতির অন্যতম নজির। বরবক শাহের আমলে তৈরি গৌড়ের দাখিল দরওয়াজা এসময়ের আরও একটি উল্লেখযোগ্য নির্মাণ। এছাড়াও সে সময়ের রাজধানী গৌড়ের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যের নজির হলো তাঁতিপাড়া মসজিদ, গুম্মত মসজিদ ও লোটান মসজিদ। ১৪৮৮ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয় ২৬ মিটার উচ্চতার ফিরোজ মিনার। ইঁট ও টেরাকোটার কাজ ছাড়া, এই মিনারটি সাদা ও নীল রং-এর চকচকে টালি দিয়েও অলংকৃত। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে তৈরি বড়ো সোনা মসজিদ গৌড়ের সবচেয়ে বড়ো মসজিদ।

ছবি ৭.২১ : ফিরোজ মিনার, গৌড়

৭.৬ সুলতানি ও মুঘল যুগের শিল্পকলা

দরবারি চিত্রকলা

সুলতানি শাসন শুরু হওয়ার আগেও ভারতে ছবি আঁকার রেওয়াজ ছিল। মন্দির ও গুহার দেয়ালচিত্র তার সাক্ষী হয়ে আছে। তবে ছবি আঁকার ক্ষেত্রে সুলতানি ও পরে মুঘল যুগে মৌলিক পরিবর্তন হয়। আস্তে আস্তে নানা চিত্রীতির মিলমিশ লক্ষ করা যায় চিত্রকলায়। বিভিন্ন অঞ্চলেও নানারকম আঞ্চলিক চিত্ররীতি তৈরি হতে দেখা যায়।

সুলতানি যুগে বই এবং পাণ্ডুলিপিতে ছবি আঁকার চল দেখা যায়। সুন্দর হাতের লেখা, রঙিন ছবি সব মিলিয়ে বইগুলি সুদৃশ্য হয়ে উঠত। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থগুলিতে এই প্রথার ছাপ পড়েছিল। *কল্পসূত্র*, *কালচক্রকথা*, *চৌরপঞ্চাশিকা* প্রভৃতি বইগুলিতে এধরণের লেখা ও ছবির ব্যবহার দেখা যায়। পারসিক মহাকাব্য *শাহনামা*-র ভারতীয় সংস্করণেও এধরনের রঙিন ছবি রয়েছে। তবে এই ছবিগুলির বিশেষ নিদর্শন দেখা যায় না।

এই চিত্রশিল্পীরা প্রধানত পশ্চিম ভারতের (গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চল) বাসিন্দা ছিলেন। এদের মধ্যে অনেকেই পরে মুঘল সম্রাট আকবরের কারখানায় যোগ দেন। সুলতানি চিত্রশিল্পের ধারা মুঘল যুগে আরও পরিণত ও উন্নত হয়ে ওঠে।

বইতে ছবি আঁকার বা অলংকরণের প্রথা সম্রাট বাবরের সময়েও দেখা যায়। এ ব্যাপারে হুমায়ুনের খুবই উৎসাহ ছিল। ইরান ও আফগানিস্তানে থাকার সময়ে তিনি আবদুস সমাদ ও মির সঈদ আলির কাজ দেখেন। মুগ্ধ হুমায়ুন পরে দিল্লিতে ফিরে তাঁদের নিয়ে মুঘল কারখানা খোলেন। সেই কারখানায় বইগুলি অপূর্ব সুন্দর হাতের লেখা ও অলংকরণ দিয়ে সাজানো হতো। *হমজানামা* বই-এর অলংকরণের কাজ হুমায়ুনের সময়েই শুরু হয়। সেই কাজ শেষ হয় আকবরের আমলে। এমন আরো উদাহরণ ছড়িয়ে আছে *রজমনামা*, *নল-দময়ন্তী*, *জাফরনামা* ইত্যাদিতে।

সুন্দর হাতের লেখার শিল্প সেকালে খুব চর্চা হতো। একে ইংরাজিতে বলে Calligraphy (ক্যালিগ্রাফি)। বাংলায় হস্তলিপিবিদ্যা বা হস্তলিপিশিল্প বলা যেতে পারে। ছাপাখানার রেওয়াজ ছিল না তখন। হাতে লেখা বইগুলিই ছিল শিল্পের নমুনা।